

কালের কণ্ঠ

এমপিও যেখানে
দুনীতিও সেখানে

শরীফুল আলম সুনন >

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের মাস্তুলি পেমেন্ট অর্ডার (এমপিও) বা বেতন-ভাতা বাবদ মাসিক সরকারি অনুদানসংক্রান্ত কার্যক্রম বিবেক্ষীকরণের সুফল মিলছে না। ঘুষ-দুনীতি ও হয়রানি রোধ করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের হাতে থাকা এই এমপিও কার্যক্রম

৯টি আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয়ে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল এক বছর আগে। কিন্তু এক বছরে লক্ষ্য পূরণ না হয়ে বরং অনিয়ম, ঘুষ-দুনীতি ও হয়রানি বেড়েছে কয়েক গুণ। এমপিও কার্যক্রম বিবেক্ষীকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুনীতিরও বিবেক্ষীকরণ হয়ে গেছে। বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। যোগ্যতা থাকলেও ঘুষ ছাড়া কোনো শিক্ষকের পক্ষেই এমপিও পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে ঘুষ দিয়ে

- আঞ্চলিক কার্যালয়ে ঘুষ ছাড়া মেলে না যোগ্য শিক্ষকদের এমপিও
- প্রতি দুই মাসে ৯ আঞ্চলিক কার্যালয় ঘিরে ১৩ কোটি টাকার ঘুষ লেনদেন
- প্রত্যেক শিক্ষকের এমপিওভুক্তিতে ঘুষ লাগছে ৩৮ থেকে ৫০ হাজার টাকা
- চার উপপরিচালকের বিরুদ্ধে দুনীতির অভিযোগ তদন্তাধীন

যোগ্যতার ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও এমপিও মিলছে অনায়াসে। স্বাভাবিক ক্ষেত্রেই একজন শিক্ষককে এমপিও পেতে ঘুষ দিতে হচ্ছে ৩৮ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা। আর যোগ্যতা বা কাগজপত্রে কোনো ঘাটতি থাকলে ঘুষের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে কয়েক গুণ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশি অধিদপ্তর ও ভুক্তভোগী শিক্ষকদের সূত্রে এসব তথ্য

জানা গেছে।

সূত্র মতে, শিক্ষকরা আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয়ের উপপরিচালক এবং জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার প্রমাণসহ প্রায়ই অভিযোগ জমা দিচ্ছেন মাউশি অধিদপ্তরে। আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয়ের ৯ জন উপপরিচালকের মধ্যে চারজনের বিরুদ্ধে দুনীতির অভিযোগ তদন্তাধীন।

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

এমপিও যেখানে, দুনীতিও সেখানে

>> প্রথম পৃষ্ঠার পর

ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক অধ্যাপক মো. আ. মোতালেব তাঁরই অঞ্চলের উপপরিচালক এ এস এম আবদুল খালেকের অনিয়ম ও দুনীতির প্রমাণ উপস্থাপন করে তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন গত ১৬ জুলাই। এরই পরিস্থিতিতে ঢাকা অঞ্চলের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফকে দিয়ে এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে মাউশি অধিদপ্তর। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমরা তদন্তকাজ শুরু করেছি। এরই মধ্যে এছাড়াও ময়মনসিংহ পরিদর্শন করেছি। আবারও যেতে হবে। তবে যেসব বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে এর সবটুকুই সত্য না হলেও কিছু বিষয় সন্দেহজনক। প্রতিবেদন চূড়ান্ত করতে আমাদের আরো বেশ কিছুদিন সময়ের প্রয়োজন।’ মাউশি অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাজীপুর মাধ্যমিক নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ১৩ জন শিক্ষক-কর্মচারী গত আগস্ট মাসে এমপিওভুক্ত হয়েছেন নিয়ম ভেঙে। একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ পাঁচজন শিক্ষক ও দুজন কর্মচারীর এমপিওভুক্তির বিধান রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, ওই ১৩ জনের এমপিওভুক্তিতে ৩০ থেকে ৪০ লাখ টাকার অবৈধ লেনদেন হয়েছে। আর এই লেনদেনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন খুলনা আঞ্চলিক শিক্ষা অধিদপ্তর উপপরিচালক টি এম জাকির হোসেন। স্কুলটিতে অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলার যে কাগজ দেখিয়ে অতিরিক্ত শিক্ষকদের এমপিও দেওয়া হয়েছে, তা ভুল বলে এরই মধ্যে প্রমাণ পেয়েছে অধিদপ্তর। কাগজে দেখানো হয়েছে, ২০০২ সালে অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলার অনুমোদন দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপর ২০০৫ সালে অনুমোদন দেয় যশোর বোর্ড। অথচ আগে দেওয়ার কথা বোর্ডের, এরপর মন্ত্রণালয়ের। প্রতিটি ক্লাসেই তিনটি সেকশন দেখানো হয়েছে। অথচ মাউশি অধিদপ্তর ওই স্কুলে খোঁজ নিয়ে গেলে, তাদের একটি সেকশনের শিক্ষার্থী নেই। ওই অবস্থায় উপপরিচালক টি এম জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে অধিদপ্তর।

এ ছাড়া ঢাকা অঞ্চলের উপপরিচালক গৌর চন্দ্র মণ্ডল এবং সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. জাহাঙ্গীর কবির আহমেদের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগের তদন্ত করছে মাউশি অধিদপ্তর। ঘুষ-বাণিজ্যে অতিষ্ঠ হয়ে গত জুলাই মাসে যশোর জেলার শিক্ষা অফিসগুলোসহ খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিরুদ্ধে মাউশি অধিদপ্তরে অভিযোগ করেছেন যশোর জেলার ২০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা। যে ২০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা অভিযোগ করেছেন সেই প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে, রায়পুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নান্দারন কলেজ, হামিদপুর মাল-হেয়া ডিগ্রি কলেজ, রঘুনাথ নগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মজিষোকা ডিগ্রি কলেজ, এবিসিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাকিমপুর মাধ্যমিক বালিকা

বিদ্যালয়, মাউশিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নেওড়াহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খেদাপাড়া পল্লী মঙ্গল বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তপসীডাঙ্গা আলিম মাদ্রাসা, বাপা আলিম মাদ্রাসা, ওয়াদীপুর আলিম মাদ্রাসা, কালারহাট আলিম মাদ্রাসা, কোটা ফাজিল ডিগ্রি কলেজ, কায়মকোলা নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ছাতিয়ানতলা দাখিল মাদ্রাসা, বালিয়াডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসা, নওয়ালী কাঁঠালতলা মাদ্রাসা ও বাগভোর দাখিল মাদ্রাসা।

ভুক্তভোগী শিক্ষকরা বলেছেন, ঘাটে ঘাটে ঘুষ না দিলে এমপিও পাওয়া যায় না। উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়—এই তিন জায়গায় ঘুষ দিলে তবেই এমপিও পাওয়া যায়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, একজন শিক্ষককে এমপিও পেতে কমপক্ষে চার জায়গায় ঘুষ দিতে হয়। প্রথমে ঘুষ দিতে হয় স্কুল থেকে নথিপত্র তৈরির জন্য নিম্নমান সহকারীকে (কেরানি)। এরপর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে ঘুষ দিতে হয়। টাকা দিলেই অনলাইন ফাইল সঠিক মতব্য করা হয়, না হলে নানা কারণ দেখিয়ে তা বাতিল করা হয়। নতুন এমপিওর ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে পদ সৃষ্টি করতে ঘুষ দিতে হয়। তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা। এরপর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে অনলাইনে ভালো মতব্য পেতে ঘুষ দিতে হয় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে প্যাকেজ হিসেবে দিলে প্রতিটি এমপিওর জন্য শিক্ষকদের দিতে হয় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। আর আলাদাভাবে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপপরিচালককে দিলে এই টাকার পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে প্রতি শিক্ষকের এমপিওতে মোট ঘুষ দিতে হয় ৩৮ থেকে ৫০ হাজার টাকা। তবে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা প্যাকেজের বাইরে আলাদাভাবে কোনো এমপিও করাতো গেলে ঘুষের ভাগ দিতে হয় সংশ্লিষ্ট উপপরিচালককেও।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ময়মনসিংহ অঞ্চলের আওতাধীন জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার জিলবাংলা চিনি কারখানা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গত মাসে এমপিওভুক্ত হয়েছেন দুজন শিক্ষক। ওই স্কুলে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিষয়ের অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও সহকারী শিক্ষক মশিউর রহমান ও মো. শফিকুল ইসলাম এমপিও পেয়েছেন। জামালপুরের বরশীপগঞ্জ উপজেলার শেফালি ফিজিক মহিলা দাখিল মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিষয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে এমপিও পেয়েছেন মাহমুদা জিন্নাত। অথচ তাঁর নিবন্ধন গণিত বিষয়ের। এমপিওর শর্ত উল্লেখ রয়েছে, যে বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে এমপিও পাবেন সে বিষয়ে অবশ্যই তাঁকে নিবন্ধনভুক্ত হতে হবে। জামালপুর সদর উপজেলার জামালপুর হাই স্কুলে সহকারী গৃহাঙ্গারিক হিসেবে এমপিও পেয়েছেন মাহমুদা আক্তার। অথচ তাঁর সনদ ভুল বলে এরই মধ্যে প্রমাণ পেয়েছে মাউশি অধিদপ্তর।

অনুসন্ধানে জানা যায়, জামালপুর সদরের ও কিশোরগঞ্জ জেলার দুজন শিক্ষক এমপিও পেয়ে

গেছেন নিয়োগের শর্ত এড়িয়ে। জামালপুরের বাঁশচরা এসবিজিএমবিএল উচ্চ বিদ্যালয়ের সমাজ বিষয়ের শিক্ষক নাজমুল হক এবং কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার কামালপুর হাজি জহির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক মো. এনায়েত উল্লাহ নিয়োগ পেয়েছিলেন অতিরিক্ত শ্রেণি শাখার আওতায় দুই বছর এমপিও না পাওয়ার শর্তে। কিন্তু তাঁরা আগেই এমপিও পেয়ে গেছেন। শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার গণপদী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ফজলুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘যারা টাকা দেয় না, উপপরিচালক এ এস এম আবদুল খালেক প্রথমে তাদের এমপিওতে নেগেটিভ কমেন্ট করে রাখেন। এরপর বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি শিক্ষকদের রোমন দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে কমেন্ট পজিটিভ করে এমপিও পাইয়ে দিচ্ছেন। আমার স্কুলেরই সহকারী প্রধান শিক্ষকের এমপিও তিনি বিনা কারণে রিজেক্ট করেছেন। ভুল্যা সার্টিফিকেটও তিনি টাকার বিনিময়ে সঠিক করে দিচ্ছেন। আমাদের কাছে আবদুল খালেকের টাকা লেনদেনের অডিও রেকর্ডও রয়েছে, যা ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। গত মাসের এমপিওগুলো যাচাই করলে আমরা বেশি প্রমাণ পাওয়া যাবে।’ তবে উপপরিচালক আবদুল খালেক অভিযোগ অস্বীকার করে কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমরা বিরুদ্ধে একটি মহল অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমি কারো কাছে থেকে কোনো প্রকার টাকা-পয়সা নিইনি। নিয়মানুযায়ী যাদের এমপিও পাওয়ার কথা তাদেরই এমপিও দেওয়া হয়েছে।’

শিক্ষকদের অভিযোগ থেকে জানা যায়, আগে তাঁদের প্রতিটি এমপিওর জন্য ঘুষ দিতে হতো ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। এখন সেই ঘুষের পরিমাণ বেড়েছে দুই-তিন গুণ। এ ছাড়া নাম, বয়সসহ নানা বিষয় সংশোধন, টাইম স্কেল ও সিলেকশন প্রভেদে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে নথি পাঠাতে ঘুষ দিতে হয় আট থেকে ১০ হাজার টাকা। জেলা শিক্ষা অফিসারকে দিতে হয় পাঁচ থেকে ১০ হাজার টাকা। এতে এ ক্ষেত্রে মোট ঘুষের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩ থেকে ২০ হাজার টাকা। যশোরের মণিরামপুর উপজেলার বাপা আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বি এম শরীফুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘অবস্থার শিকার হয়ে ঘুষ দিতে হয়। কাজটা যাতে তাড়াতড়ি হয় এ জন্য শিক্ষকরা ঘুষ দিয়ে থাকেন। কারণ একজন শিক্ষকের এমপিওর ফাইল যদি ছয় মাস আটকে থাকে তাহলে তিনি প্রায় ৯০ হাজার টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন। তবে আমরা এই ঘুষ দিতে চাই না। এর প্রতিকার চাই।’ দেশে এখন এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী। মাউশি অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৪০ জন শিক্ষক-কর্মচারী অবসরে যান। এর বিপরীতেই নতুন শিক্ষকদের এমপিও দেওয়া হয় দুই মাস পরপর। প্রতি দুই মাসে সারা দেশে প্রায় আড়াই হাজার নতুন শিক্ষক এমপিওভুক্ত

হন। প্রতি দুই মাস অন্তর এক থেকে দেড় হাজার শিক্ষক উচ্চতর গ্রেডসহ নানা সুবিধা পান। এমপিও বিবেক্ষীকরণের ফলে সব কাজই এখন হয় আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে। অভিযোগ রয়েছে, এমপিও দেওয়ার আগ মুহূর্তে প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রায় দেড় কোটি টাকার ঘুষ লেনদেন হয়। ফলে দুই মাসে শুধু শিক্ষক এমপিওভুক্তি ও উচ্চতর গ্রেড দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় ১৩ কোটি টাকার ঘুষ লেনদেন হয়। মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক এ এস এম ওয়াহিদুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘শিক্ষকদের বলব, তাঁরা ঘুষ দেন কেন? যদি কোনো কাগজে সমস্যা থাকে তাহলে তাঁরা সেটা ঠিক করে দিক। তবে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি অনায়াসে, অনৈতিকভাবে কারো কাছ থেকে ঘুষ নেন তাহলে অবশ্যই আমরা তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। এরই মধ্যে এসব ব্যাপারে তদন্তও চলছে। আর কোনো শিক্ষক যদি একবার এমপিও মিস করেন তাহলে তিনি দুই মাসের প্রাপ্য বেতন থেকে বঞ্চিত হন, এটাও কর্মকর্তাদের মনে রাখতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘আসলে সমস্যা অন্য জায়গায়। দেখা যায়, সার্টিফিকেটে সমস্যা আছে বা অন্য সমস্যা আছে। সেগুলোই টাকা দিয়ে রফাক্ষা হয়।’ তবে অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।’

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুকাদ্দ আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমরাও শিক্ষক এমপিওতে দুনীতির বিষয়ে প্রচুর অভিযোগ পাচ্ছি।’ আসলে বিবেক্ষীকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুনীতিও ছড়িয়ে পড়েছে। এর অর্থ এই নয় যে কেহ দুনীতি ছিল না। তবে আমরা ঘুষ গ্রহণের জেনুইন কু চাই। যাতে আমরা ধরতে পারি। তবে অনেক ক্ষেত্রেই যারা ঘুষ দেন তাঁরা প্রকাশ্যে আসতে চান না, যা একটি বড় সমস্যা। এর পরও আমরা অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করি।’

সূত্র জানায়, গত বছরের অক্টোবর থেকে ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে সব এমপিও কার্যক্রম চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি চিঠিতে এমপিও বিবেক্ষীকরণের জন্য নির্দেশ দিলেও প্রথমে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এবং ২০১৮ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এমপিও বিবেক্ষীকরণের নির্দেশ ছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ না মেনে একযোগে সব আঞ্চলিক কার্যালয়েই এমপিও কার্যক্রম চালু করা হয়। কিন্তু আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে দক্ষ লোকবল না থাকায় শিক্ষকরা নানা কাজে হরানির শিকার হচ্ছেন। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, আঞ্চলিক কার্যালয়ে সম্প্রতি পরিচালকের একটি পদ সৃষ্টি করে পদায়ন করা হলেও এমপিওর সব দায়িত্বই রেখে দেওয়া হয়েছে উপপরিচালকদের হাতে। ফলে এসব উপপরিচালক বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। এমনকি এখন শিক্ষা প্রশাসনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপপরিচালকের পদগুলো। ২০ লাখ টাকা ঘুষ দিয়েও এসব পদে যেতে আগ্রহী অনেক কর্মকর্তা।